৬

বায়ুমণ্ডলীয় কাঠামো
Atmospheric Structure

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান তিনটি অংশ হলো- অশ্মমণ্ডল (Lithosphere), বায়ুমণ্ডল (Atmosphere), বারিমণ্ডল (Hydrosphere)। এই তিনটি অংশের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে জীবমণ্ডল (Biosphere) । জীবমণ্ডল এর গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো ভূ-ত্বক, যেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বসবাস করে। জীবনধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন উপাদানসমূহের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ ও তার বসবাসকৃত পরিবেশ প্রভাবিত হয়। যেমন - বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যায়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যত পৃথিবীর টেকসই পরিবেশের জন্য বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তর, বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও স্তর , পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার ভারসাম্য, বায়ুচাপ ও আদ্রতা এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -৬.১ : ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তর

পাঠ -৬.২ : বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও স্তর

পাঠ -৬.৩ : পৃথিবীর তাপসমতা

পাঠ -৬.৪ : বায়ুচাপ ও আদ্রতা

পাঠ -৬.৫ : আবহাওয়া ও জলবায়ু

পাঠ-৬.১ ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তর
Earth Crust and Earth Core

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠ এর সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

মানুষ ও জীবকূলের বসবাসকৃত পরিবেশের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অশ্মমণ্ডলের ওপরের কঠিন বহিরাবরণকে ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠ বলা হয়। সাধারণভাবে, ভূ-পৃষ্ঠের গড় গভীরতা প্রায় ২০ কিলোমিটার ধরা হয়। যদিও সমুদ্রের তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের গভীরতা ৩ কিলোমিটার এবং পর্বতের তলদেশে এর গভীরতা প্রায় ৪০ কিলোমিটার। স্থলভাগের ভূ-ত্বককে মহাদেশীয় ভূ-ত্বক এবং সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বককে মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক বলে। ভূ-ত্বক বিভিন্ন ধরনের শিলা এবং খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত হলেও মহাদেশীয় ভূ-ত্বক এবং মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের মধ্যে গঠনগত উপাদানের ভিন্নতা রয়েছে। ভূ-কম্পন তরঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মহাদেশীয় ভূ-ত্বক মেফিক এবং ফেলসিক শিলা দ্বারা গঠিত। মেফিক শিলা ম্যাগনেসিয়াম এবং লোহা সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজে গঠিত। ফেলসিক শিলার রাসায়নিক গঠন গ্রানাইটের ন্যায়। ফেলসিক শিলা প্রধানত কোয়ার্টাজ এবং ফেল্সপার সমৃদ্ধ সিলেকেট খনিজের অন্তর্ভুক্ত। যদিও মেফিক এবং ফেলসিক শিলাস্তরের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। মূলত মহাদেশীয় ভূ-ত্বক ফেলসিক স্তরবিহীন। সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বক প্রধানত ব্যাসল্ট শিলার প্রধান দুটি খনিজ যথা সিলিকন (Si) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) দ্বারা গঠিত। এই ব্যাসল্ট শিলাস্তরই মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের নিচে গভীর সমদ্রের তলদেশে মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক হিসেবে রয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তর
Earth Crust and Earth Core

ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তর ভাগকে প্রধান তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার (Lithospherse)

গুরুমণ্ডল (Mantle)

কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere)[1]।

১. **অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার (Lithospherse):** অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ারের ওপরের অংশকে ভূ-ত্বক বলে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার বিস্তৃত। চিত্র-৬.১ লক্ষ করুন। ভূ-ত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটার গভীরতায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অশ্মমণ্ডলের উপাদানের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম উল্লেখযোগ্য। এই সকল উপাদান অক্সিজেনের সাথে নির্দিষ্ট হারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সাইড সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এই অক্সাইড বা খনিজ মিশ্রিত হয়ে যে পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে শিলা বলে। লিথোস্ফিয়ারের এই শিলাসমূহের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে লিথোস্ফিয়ার বা ভূ-ত্বককে

প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- ভূ-ত্বকের পৃষ্ঠের হালকা ঘন শিলাস্তর, ভূ-ত্বকের নিচের মধ্যম ঘন শিলাস্তর ও অলিভিন জাতীয় শিলাস্তর।

---

[1] Turcotle, D.L.; Schubert, G. (2002), ``4''. Geody hamics (2ed.), Cambridge England, UK: Cambridge University Press. pp136-137. ISBN 978-0-521-666-24-4

ক. ভূ-ত্বকের পৃষ্ঠের হালকা ঘন শিলাস্তর (Light Thick Rock layer of Earth Crust): এটি ভূ-ত্বকের প্রথম শিলাস্তর যেখানে মানুষ ও জীবকূল বসবাস করে এবং গাছপালা ও তৃণগুল্ম জন্মায়। এই স্তরকে গ্রানাইট শিলাস্তর বলে। গ্রানাইটে সিলিকা (Silica) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Aluminium) পরিমাণ সর্বাধিক বলে একে সিয়াল (Sial) স্তর ও বলা হয়। এই শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ৬.২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ অর্থাৎ মহাদেশসমূহ এই ধরনের শিলায় গঠিত। এই শিলাস্তরের গড় গভীরতা প্রায় ১২.৮ কিলোমিটার। এই জাতীয় শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫-২.৯৫।

চিত্র - ৬.১ ভূ-পৃষ্ঠ, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল

খ. ভূ-ত্বকের মধ্যম ঘন শিলাস্তর (Medium Thick Middle Rock layers of Earth Crust): এটি মধ্যবর্তী শিলাস্তর অর্থাৎ সিয়াল স্তরের ভূ-ত্বকের পরবর্তী স্তর। এই স্তর ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত। ব্যাসল্ট শিলার রাসায়নিক উপাদানসমূহ হলো সিলিকা (Silica) ও ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)। তাই এই স্তরকে সিমাস্তরও বলা হয়। এই শিলাস্তর দ্বারা মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক গঠিত হয়। সমুদ্র তলদেশে গ্রানাইট শিলাস্তর শেষ হওয়ার পর ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা শুরু হয়। এই স্তরের মধ্য দিয়ে ভূ-কম্পনের তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ৭ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। এই শিলাস্তরের গড় গভীরতা ২০ কি.মি. হতে ৩২ কি.মি. । ভূ-ত্বকের প্রথম ও দ্বিতীয় শিলাস্তর অর্থাৎ সিয়াল ও সিমা স্তরের মধ্যবর্তী যে সীমারেখায় মিলিত হয়েছে তাকে কনরাড বিযুক্তি (Conrad Discontinuity) বলে। এই স্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৯৫-৩.৪।

গ. অলিভিন জাতীয় শিলা (Olivin Types Rocks): ভূ-ত্বকের বা লিথোস্ফিয়ারের সর্বনিম্ন স্তরটিতে অলিভিন জাতীয় শিলা অধিক থাকে। এই স্তরে ভূ-কম্পন তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে ৮ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। অলিভিন জাতীয় শিলা খনিজ ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও লৌহের (Fe) সিলিকেটের সমন্বয়ে গঠিত। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৩।

২. **গুরুমণ্ডল (Mantle):** লিথোস্ফিয়ারের নিচের অংশ এবং বায়োস্ফিয়ার এর ওপরের অংশের মিলনস্থলে একটি বিযুক্তি রয়েছে। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী মোহোরোভিসিক প্রথম এই বিযুক্তি আবিস্কার করেন বলে সংক্ষেপে একে মোহো বিযুক্তি বলে। এই স্তরে সিলিকন এবং ম্যাগনেসিয়ামের আধিক্য বেশি। গুরুমণ্ডলের এই অংশটি লিথোস্ফিয়ারের নিচে অবস্থান করে এবং ভূ-অভ্যন্তরে ৭০০ কি.মি. হতে ২,৯০০ কি.মি. গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৩. **কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere):** ভূ-অভ্যন্তরের কেন্দ্রে তাপ ও চাপের তীব্রতা অধিক হওয়ার কারণে এই অঞ্চলটি কঠিন অবস্থায় রয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরের বায়োস্ফিয়ার এবং কেন্দ্রমণ্ডলকে পৃথককারী রেখাকে গুটেনবার্গ বিযুক্তি (Gutenberg discontinuity) বলে। কেন্দ্রে লোহা এবং নিকেলের আধিক্য বেশি। এছাড়াও কেন্দ্রমণ্ডলের উপাদানসমূহ হলো- পারদ ও সিসা । গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ৩,৪৭৯ কিলোমিটার পর্যন্ত কেন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত ।

সারসংক্ষেপ:

মানুষ ও জীবকূলের বসবাসকৃত পরিবেশের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অশ্মমণ্ডলের ওপরের কঠিন বহিরাবরণকে ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠ বলা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের গড় গভীরতা প্রায় ২০ কিলোমিটার। সমুদ্রের তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের গভীরতা ৩ কিলোমিটার এবং পর্বতের তলদেশে এর গভীরতা প্রায় ৪০ কিলোমিটার। স্থলভাগের ভূ-ত্বককে মহাদেশীয় ভূ-ত্বক এবং সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বককে মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক বলে। ভূ-ত্বক বিভিন্ন ধরনের শিলা এবং খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত হলেও মহাদেশীয় ভূ-ত্বক এবং মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের মধ্যে গঠনগত উপাদানের ভিন্নতা রয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরকে প্রধান তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা- অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার, গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল। অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ারের ওপরের অংশকে ভূ-ত্বক বলে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার বিস্তৃত। অশ্মমণ্ডলের উপাদানের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম উল্লেখযোগ্য। গুরুমণ্ডল লিথোস্ফিয়ারের নিচে অবস্থান করে এবং ভূ-অভ্যন্তরে ৭০০ কি.মি. হতে ২,৯০০ কি.মি. গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ৩,৪৭৯ কিলোমিটার পর্যন্ত কেন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত। কেন্দ্রে লোহা এবং নিকেলের আধিক্য বেশি। এছাড়াও কেন্দ্রমণ্ডলের উপাদানসমূহ হলো- পারদ ও সিসা ।

পাঠ-৬.২ বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও স্তর
Elements and layers of the Atmosphere

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বায়ুমণ্ডল অদৃশ্য এবং বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বায়ুমণ্ডল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর অপরিহার্য প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে পৃথিবীর সাথে সাথে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে।

বায়ুমণ্ডল কী
What is Atmosphere

বায়ুমণ্ডল বায়ুর বিভিন্ন স্তর। বায়ুমণ্ডলের বায়ুর বিভিন্ন স্তরের সাথে এবং ওপরের বায়ুর সাথে সংলগ্ন নিচের বায়ুকে ক্রমাগত চাপ প্রদান করে। এ কারণে পৃথিবীতে ভূ-ত্বকের নিকটস্থ বায়ুর স্তর খুবই ঘন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে প্রায় বায়ুমণ্ডলের ১০,০০০ কি. মি. পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব এবং পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার জন্য বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য ইউনিটে বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান
Elements of the Atmosphere

বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বিশুদ্ধ বায়ুর ৯৯ শতাংশই নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ ০.০০৩ শতাংশ হলেও এটি বায়ুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মূল কারণ পৃথিবী থেকে বিকিরণকৃত তাপশক্তি শোষণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ রাখে কিন্তু বর্তমানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডলের জন্য হুমকি কারণ এতে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশুদ্ধ বায়ুতে নাইট্রোজেন (N_2) ৭৮.০২ শতাংশ, অক্সিজেন (O_2) ২০.৭১ শতাংশ, অবশিষ্ট ১ শতাংশ আর্গণ (Ar), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), ওজোন (O_3) এবং অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন এবং নাইট্রাস অক্সাইড), জলীয় বাষ্প এবং ধূলিকণা রয়েছে।

টেবিল - ৬.১ বায়ুমণ্ডলের উপাদানের পরিমাণ

উপাদানের নাম	**শতকরা অংশ**
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আর্গন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	০.০০৩
ওজোন (O_3)	০.০০০১
অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন এবং নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০১৯৯
জলীয় বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা	০.০১
মোট	১০০

বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলকে প্রধান দুইটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে যথা- সমমণ্ডল (Homosphere) এবং বিষমমণ্ডল (Heterosphere)।

সমমণ্ডল

Homosphere

ভূ-পৃষ্ঠ হতে ওপরের দিকে প্রায় ৯০ কি. মি. পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক সংযুক্তি বিশেষত বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত প্রায় একই ধরনের থাকে। এ কারণে বায়ুমণ্ডলের এ অংশকে সমমণ্ডল বলে। সমমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন এর পরিমাণ সর্বাধিক । বায়ুমণ্ডলে আর্গন, নিওন, হিলিয়াম, ক্রিপটন এবং জেনন প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ সামান্য এবং এইসকল গ্যাস বায়ুমণ্ডলে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না কারণ এর বায়ুমণ্ডলের নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন এবং নাইট্রাস-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণও অত্যন্ত সামান্য।

বিষমমণ্ডল

Heterosphere

সমমণ্ডলের ৯০ কি. মি. এর উর্ধ্বের অংশকে বিষমমণ্ডল বলে। বিষমমণ্ডলকে প্রধান চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। বিষমমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরটি আনবিক নাইট্রোজেন স্তর। এটি উর্ধ্বে প্রায় ২০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। আনবিক স্তরের উর্ধ্বে ২০০ কি. মি. হতে প্রায় ১,১০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর অক্সিজেন দিয়ে গঠিত পারমানবিক অক্সিজেন স্তর নামে পরিচিত। হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত। যা পারমানবিক অক্সিজেন স্তরের উর্ধ্বে ১,১০০ কি. মি. হতে ৩,৫০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটি হিলিয়াম স্তর। হিলিয়াম স্তরের উর্ধ্বে প্রায় ১০,০০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটিকে হাইড্রোজেন স্তর বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলের স্তর

Layers of the Atmosphere

বায়ুর তাপমাত্রার বিন্যাসের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলকে প্রধান ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে[২], চিত্র-৬.২ লক্ষ করুন। বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ হলো -

১. ট্রপোস্ফেয়ার (Trposphere)
২. স্ট্রাটোস্ফেয়ার (Stratosphere)
৩. মেসোস্ফেয়ার (Mesosphere)
৪. থার্মোস্ফেয়ার (Thermosphere)
5. আয়নোস্ফেয়ার (Ionosphere)
৬. এক্সোস্ফেয়ার (Exosphere)

১. **ট্রপোস্ফেয়ার (Trposphere):** এটি ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তর। ট্রপোস (Tropos) অর্থ পরিবর্তন। মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি এই স্তরে দেখা যায়। এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ওপরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এই তাপ হ্রাসকে স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হার (Normal Lapse Rate) বলে। তাপমাত্রা হাসের হার প্রতি কিলোমিটারে ৬.৫° সেলসিয়াস। জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব নিচের দিক থেকে উপরের দিকে কমতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ট্রপোমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১৬-১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে ট্রপোমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ০৮ কিলোমিটার। ট্রপোস্ফেয়ারের সবচাইতে ওপরের স্তরটি স্ট্রাটোস্ফেয়ারের সাথে মিলে যায় এবং ঐ মিলিত স্থানকে ট্রপোপোজ (Tropopause) বলে। ট্রপোমণ্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বাস করে।

২. **স্ট্রাটোস্ফেয়ার (Stratosphere):** ট্রপোস্ফেয়ার এর ওপরের অংশ ট্রপোপজ এর উর্ধ্বসীমা থেকে মেসোস্ফেয়ারের নিচের অংশকে স্ট্রাটোস্ফেয়ার বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটির নিজস্ব বিন্যস্ত স্তর (Set of layers) রয়েছে। তাই এই

[2] *Earth's Atmospheric Layers*. NASA. (2021). https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/earths-atmospheric-layers/.

স্তরকে স্ট্রাটোস্ফেয়ার বলা হয়। স্ট্রাটোস্ফেয়ারে কোনো ঝড় বৃষ্টি এবং বায়ুর ঘূর্ণন দেখা যায় না। এ স্তরের নিচের দিকে ভারী ঠান্ডা বায়ু এবং ওপরের দিকে হালকা বায়ু থাকে, জলীয়বাষ্প ও ধূলিকণা নেই বললেই চলে। বাতাসের ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতি নেই বলে এ স্তরের মধ্য দিয়ে বিমান চলাচল করে।

চিত্র - ৬.২ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ[৩]

স্ট্রাটোস্ফেয়ারে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর যা ওজোনোস্ফেয়ার নামে পরিচিত। এই ওজোন স্তরটি সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra Violet Rays) শোষণ করে। জীবজগতে জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে যেত যদি ওজোন স্তর পৃথিবীকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা না করত। সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করায় এবং বিমান চলাচলের জন্য বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **মেসোস্ফেয়ার (Mesosphere):** মেসো (Meso) অর্থ মধ্যভাগ (middle)। মেসোস্ফেয়ার সাধারণত থার্মোস্ফেয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফেয়ার এর মাঝ বরাবর অবস্থান করে। এই স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম এবং মেঘ ও জলীয় বাষ্পহীন। ফলে এখানে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্ভব নয়। এই স্তরের ওপরের অংশকে মোসোপজ (Mesopause) বলে।

৪. **থার্মোস্ফেয়ার (Thermosphere):** মেসোপজ এর ওপরের অংশ এবং এক্সোস্ফেয়ারের নিচের অংশ অর্থাৎ মেসোস্ফেয়ার এবং এক্সোস্ফেয়ারের মাঝামারি অংশকে থার্মোস্ফেয়ার বলে। থার্মো (Thermo) অর্থ তাপ এবং এই স্তরের তাপমাত্রা ৪৫০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। শব্দ তরঙ্গ এবং তাপমাত্রা পরিবহনের জন্য এই স্তরে পর্যাপ্ত কোন গ্যাস নেই। এই স্তরটির ঘনত্ব ৫১৩ কিলোমিটার। থার্মোস্ফেয়ার পৃথিবীর অরবিটের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন (International Space Station) হিসেবে ধরা হয়। তাছাড়াও এখানে অরবিট সেটেলাইট (Orbit Sateltites)পাওয়া যায়। চিত্র- ৬.২ লক্ষ করুন।

[3] *Earth's Atmospheric Layers*. NASA. (2021). https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-layers2.html.

৫. **আয়োনস্ফেয়ার (Ionosphere):** আয়োনস্ফেয়ার বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত কার্যকর স্তর। কারণ এটি একইসাথে মেসোস্ফেয়ার, থার্মোস্ফেয়ার এবং এক্সোস্ফেয়ারকে প্রভাবিত করে। এই স্তরের কার্যক্রম নির্ভর করে সূর্য থেকে গৃহীত সৌরশক্তির উপর। এই স্তরের অক্সিজেন সৌরশক্তি ব্যবহার করে অক্সিজেন অণুগুলোকে ভেঙ্গে বিদ্যুৎযুক্ত কণায় পরিণত করে যার ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আছে। এই বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে আয়ন (Ion) বলে এবং এই স্তরকে আয়োনস্ফেয়ার বলে। একই সাথে সূর্যের এবং পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা আয়োনস্ফেয়ারের চার্জ পার্টিক্যালসমূহ প্রভাবিত হয়। যার দরুন চুম্বকীয় আকর্ষণের টানে বিদ্যুৎযুক্ত কণা জড়ো হয়ে উভয়গোলার্ধে মেরু আলো (Auroras) তৈরি করে। উত্তর গোলার্ধে মেরু আলো অরোরা বোরিয়ালিস (Aurora Borealis) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মেরু আলো আরোরা অস্ট্রালিস (Aurora Australis) নামে পরিচিত। যার দরুন উত্তর গোলার্ধে রাতের আকাশে আলোর বর্ণালি বা আলোক প্রভা দেখা যায়। আয়োনস্ফেয়ারের চার্জ পার্টিক্যালসমূহ প্রভাবিত হয় প্রধানত পৃথিবী এবং সূর্যের চুম্বকীয় ক্ষেত্রের (magnetic field) মাধ্যমে আর এখানেই অরোরা তৈরি হয়। অরোরা হলো উজ্জ্বল সুন্দর আলোর ব্যাণ্ড, যা প্রধানত মেরু অঞ্চলে তৈরি হয়।

৬. **এক্সোস্ফেয়ার (Exosphere):** নাসা সম্প্রতি এক্সোস্ফেয়ারকে বায়ুমণ্ডলের পৃথক স্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আয়নস্ফেয়ারের ওপরের দুটি অংশের একটি হলো এক্সোস্ফেয়ার অপরটি হলো চুম্বকীয় মণ্ডল। এক্সোস্ফেয়ার প্রধানত অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরমাণু দ্বারা গঠিত। এক্সোস্ফেয়ার সূর্য থেকে আগত অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুতায়িত বিকিরণ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সুরক্ষিত করে। এ বিদ্যুতায়িত বিকিরণ সৌর ঝড় হিসেবে চুম্বকীয়মণ্ডলে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে বহিঃবিভাগ দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ:

বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে প্রায় বায়ুমণ্ডলের ১০,০০০ কি. মি. পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বিশুদ্ধ বায়ুর ৯৯ শতাংশই নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলকে প্রধান দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে যথা- সমমণ্ডল এবং বিষমমণ্ডল । বায়ুর তাপমাত্রার বিন্যাসের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহকে প্রধান ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা ট্রপোস্ফেয়ার, স্ট্রাটোস্ফেয়ার, আয়োনস্ফেয়ার এবং এক্সোস্ফেয়ার। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরটি ট্রপোস্ফেয়ার। এই স্তর থেকে যতোই ওপরের দিকে ওঠা যায় ততই বায়ুর চাপ ও ঘনত্ব কমতে থাকে। ট্রপোস্ফেয়ার এর পরবর্তী স্তরটি স্ট্রাটোস্ফেয়ার। এই স্তরে বায়ুর তাপ ও চাপ একই রকম থাকে বলে এই স্তরে নির্বিঘ্নে বিমান চলাচল করে। স্ট্রাটোস্ফেয়ারে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর যা ওজোনোস্ফেয়ার নামে পরিচিত। এই ওজোন স্তরটি সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra Violet Rays) শোষণ করে। থার্মোস্ফেয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফেয়ার এর মাঝ বরাবর মেসোস্ফেয়ার অবস্থান করে। এই স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম এবং মেঘ ও জলীয় বাষ্পহীন। ফলে এখানে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্ভব নয়। আয়োনস্ফেয়ার বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত কার্যকর স্তর। আয়োনস্ফেয়ারের বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে আয়ন (Ion) বলে । এই স্তরের চুম্বকীয় আকর্ষণের টানে বিদ্যুৎযুক্ত কণা জড়ো হয়ে উভয় গোলার্ধে মেরু আলো (Auroras) তৈরি হয়। নাসা সম্প্রতি এক্সোস্ফেয়ারকে বায়ুমণ্ডলের পৃথক স্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মূলত আয়োনস্ফেয়ারের ওপরের দুটি অংশের একটি হলো এক্সোস্ফেয়ার অপরটি হলো চুম্বকীয় মণ্ডল।

পাঠ-৬.৩ পৃথিবীর তাপসমতা
Terrestrial Heat Balance

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- তাপমাত্রা ও সৌরতাপ সর্ম্পকে বলতে পারবেন;
- পৃথিবীর তাপসমতা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতম বা শীতলতম অবস্থাকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বলে। পৃথিবী সূর্য থেকে যে পরিমাণ সৌরশক্তি (তাপ ও আলো) গ্রহণ করে তাকে সৌরতাপ বলে। বায়ুমণ্ডল যে প্রকারে সূর্য থেকে তাপগ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ বা শীতল রাখে তাকে তাপগ্রহণ বলে। পৃথিবীর সকল তাপ ও আলোর উৎস সূর্য। সূর্যের কেন্দ্রভাগের তাপমাত্রা ১৫০,০০,০০০° সেন্টিগ্রেড এবং পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা ৬০০০° সেন্টিগ্রেড । সূর্যের মোট উত্তাপের ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কখনো অনেক বৃদ্ধি পায় না আবার কখনো অনেক কমে যায় না। অর্থাৎ যে পরিমাণ সৌরশক্তি গ্রহণ করে সেই পরিমাণ সৌরশক্তি কোনো না কোনো উপায়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। যার দরুন গড় তাপমাত্রা কখনো অনেক বেশি বা কম হয় না । পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপের এই ধরনের সমতা রক্ষার প্রক্রিয়াকে তাপসমতা বা তাপস্থিতি বলে। নিম্নে পৃথিবীর তাপসমতা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর তাপসমতা

Heat Balance of the earth

সৌরতাপের ১০০ শতাংশের মধ্যে ৬৬ শতাংশ শক্তি পৃথিবী সূর্য থেকে গ্রহণ করেছে এবং একই পরিমাণ শক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে মহাশূন্যে সরাসরি বিকিরণ হচ্ছে। বাকি ৩৪ শতাংশ সৌরতাপ নিষ্ক্রিয় সৌরতাপ বা অ্যালবেডো (Albedo) বায়ুমণ্ডল, মেঘপুঞ্জ ও ভূ-পৃষ্ঠে হতে মহাশূন্যে সরাসরি প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ সৌরতাপের ১০০ শতাংশ পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যায় এবং পৃথিবীর তাপের সমতা রক্ষা করছে। একে পৃথিবীর তাপের সমতা (Terrestrial Heat Balance) বলে। এরূপে কার্যকরী সৌরতাপ বিকিরণ না হলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর উত্তাপ সমতা নষ্ট হয়ে যেত।

সৌরতাপের ৬৬ শতাংশ বায়ুমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। এই ৬৬ শতাংশ সৌরতাপ বিকিরণকে কার্যকরী সৌর তাপ (Effective Solar Insolation) বলে। অবশিষ্ট ৩৪ শতাংশ ব্যবহৃত না হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এই ধরনের নিষ্ক্রিয় সৌরতাপকে অ্যালবেডো (Albedo) বলে। কার্যকরী সৌরতাপের পৃথিবীর তাপমাত্রা যতটুকু বৃদ্ধি করছে ঠিক সমপরিমাণ তাপশক্তি (কার্যকরী সৌরতাপ) বিভিন্নভাবে বিকিরণের মাধ্যমে মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে ।

সৌরতাপের সম্ভাব্য তাপসমতা :

১. মহাশূন্যে বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত তাপ বা অ্যালবেডো হলো মোট ৩৪ শতাংশ । এই ৩৪ শতাংশ তাপের বণ্টন হলো-

ক) মেঘ হতে প্রতিফলিত	২৫%
খ) ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রতিফলিত	২%
গ) বায়ুমণ্ডল কর্তৃক বিচ্ছুরিত	৭%
মোট	৩৪ শতাংশ

২. বায়ুমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত তাপ মোট ১৯ শতাংশ। উক্ত ১৯ শতাংশ তাপের মধ্যে বায়ুমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের মেঘ, ধূলিকণা কর্তৃক গৃহীত তাপের পরিমাণ-

ক) বায়ুমণ্ডল গ্রহণ করে	১৭%
খ) বায়ুমণ্ডলের মেঘ, ধূলিকণা কর্তৃক গৃহীত তাপ	২%
মোট	১৯ শতাংশ

৩. ভূ-পৃষ্ঠ কর্তৃক গৃহীত তাপ মোট তাপ ৪৭ শতাংশ। উক্ত তাপের ৪৭ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে, আলোর বিকিরণের মাধ্যমে এবং মেঘের প্রতিফলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়। গৃহীত তাপের পরিমাণ নিম্নরূপ-

ক) সূর্যরশ্মি প্রত্যক্ষভাবে	১৯%
খ) আলোর বিকিরণের মাধ্যমে	৫%
গ) মেঘের প্রতিফলনের মাধ্যমে	২৩%
মোট	৪৭ শতাংশ

অর্থাৎ কার্যকরী সৌরতাপের পরিমাণ হচ্ছে মোট ৬৬ শতাংশ। সৌরতাপের ১০০ শতাংশের মধ্যে বাকি ৩৪ শতাংশ বায়ুমণ্ডল, মেঘপুঞ্জ ও ভূ-পৃষ্ঠে হতে মহাশূন্যে সরাসরি প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়। অবশিষ্ট ৬৬ শতাংশ সৌরতাপের মধ্যে বায়ুমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯ শতাংশ এবং ভূ-পৃষ্ঠ কর্তৃক গৃহীত হয় ৪৭ শতাংশ। এই কার্যকরী ৬৬ শতাংশ সৌরতাপ বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবী কর্তৃক যেমন গৃহীত হয় তেমনি ২৩ শতাংশ মেঘ থেকে বিকিরণ হয়, ১০ শতাংশ দীর্ঘ তরঙ্গরূপে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরণ হয় এবং ৩৩ শতাংশ সৌরশক্তি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মেঘ, ওজোন থেকে বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ কার্যকরী সৌরতাপের মোট ৬৬ শতাংশ ফিরে যাচ্ছে । এভাবেই পৃথিবীর পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা কখনো অধিক বা কম হয় না। এভাবেই পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সমতা রক্ষা হয়।

সারসংক্ষেপ:

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতম বা শীতলতম অবস্থাকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বলে। পৃথিবী সূর্য থেকে যে পরিমাণ সৌরশক্তি (তাপ ও আলো) গ্রহণ করে তাকে সৌরতাপ বলে। বায়ুমণ্ডল যে প্রকারে সূর্য থেকে তাপগ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ বা শীতল রাখে তাকে তাপগ্রহণ বলে। পৃথিবীর সকল তাপ ও আলোর উৎস সূর্য। সূর্যের কেন্দ্রভাগের তাপমাত্রা ১৫০,০০,০০০° সেন্টিগ্রেড এবং পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা ৬০০০° সেন্টিগ্রেড । সূর্যের মোট উত্তাপের ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কখনো অনেক বৃদ্ধি পায় না আবার কখনো অনেক কমে যায় না। অর্থাৎ যে পরিমাণ সৌরশক্তি গ্রহণ করে সেই পরিমাণ সৌরশক্তি কোনো না কোনো উপায়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। যার দরুন গড় তাপমাত্রা কখনো অনেক বেশি বা কম হয় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপের এই ধরনের সমতা রক্ষার প্রক্রিয়াকে তাপসমতা বা তাপস্থিতি বলে।

পাঠ-৬.৪ বায়ুচাপ ও আদ্রতা
Air Pressure and Humidity

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুর চাপের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- বায়ুচাপ নির্ণয় করতে পারবেন;
- পৃথিবীর প্রধান বায়ুর চাপবলয়সমূহ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আবহাওয়া, জলবায়ু এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বায়ুচাপ ও আদ্রতা, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য ইউনিটে বায়ুচাপ, আদ্রতা ও পৃথিবীর প্রধান বায়ুর চাপবলয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বায়ুর চাপ
Air Pressure

কোনো একক ক্ষেত্রফলের ওপর বায়ুর প্রযুক্ত বলের পরিমাণকে বায়ুচাপ বলে। বায়ুচাপের একককে 'বার' বলে, যা ১০,০০,০০০ ডাইন/ সেমি^{২} এর সমান। যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুরচাপ নির্ণয় করা হয় তাকে ব্যারোমিটার বলে। কোনো মানচিত্রে বা আবহাওয়া চিত্রে সমান বায়ুচাপবিশিষ্ট স্থানগুলোকে যে রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয় সেইসব রেখাকে সমচাপরেখা (isobar) বলে। বায়ুচাপ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো-

$$p = \frac{F}{A}$$

এখানে,

P = বায়ুস্তরের উপরিভাগের চাপ

F = বায়ুর নিচের স্তরের তাপমাত্রা

A = বায়ুস্তরটির গভীরতা

সমচাপ রেখার সাথে সমকোন করে প্রতি একক আনুভূমিক দূরত্বে বায়ুচাপের যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে চাপ নতি বা চাপ অবক্রম বলে। চাপ অবক্রমকে ব্যারোমেট্রিক ঢালও (barometric slope) বলে। চাপ নতি বা চাপ অবক্রম প্রকাশ করার জন্য উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। উচ্চ চাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে সমচাপরেখার সাথে সমকোণে যে শক্তি কাজ করে তাকে চাপের অবক্রমজনিত বল বলে।

গাণিতিকভাবে,

$$PGF = \frac{1}{P} \cdot \frac{dp}{dn}$$

এখানে,

p = বায়ুর ঘনত্ব

dp = দুটি স্থানের মধ্যবর্তী বায়ুচাপের পার্থক্য

dn = স্থান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব

dp/dn= আনুভূমিক বায়ুচাপ অবক্রম

PGF = চাপের অবক্রমজনিত বল।

আশে পাশের বায়ুচাপের সাথে তুলনা করে কোনো স্থানের বায়ুর উচ্চ ও নিম্নচাপ বলা হয়। সাধারণত উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর চাপ প্রায় ১১৫ মিলিবার কমে। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রভাবিত হয়। বায়ুচাপ আনুভূমিক (Horizontal) দিক অপেক্ষা উলম্বভাবে (Vertical) অধিক পরিবর্তিত হয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুরচাপ ১০১৩ মিলিবার এবং উচ্চ পর্বত শিখরে (৮৮৪৮ মি. উচ্চতা) ৩২০ মিলিবার।

১ মিলিবার = ১০০ নিউটন / বর্গমিটার

১ নিউটন = ১ কিলোগ্রাম - মিটার / বর্গ সেকেন্ড

বায়ুর চাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক।

বায়ুর চাপবলয়সমূহ

Air Pressure Belts

পৃথিবীতে প্রধানত ৭টি চাপ বলয় আছে। চিত্র-৬.৩ লক্ষ করুন।

১। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়

২। উপক্রান্তীয় উষ্ণ উচ্চ চাপ বলয়

৩। উপক্রান্তীয় দক্ষিণ উচ্চচাপ বলয়

৪। উপমেরু উত্তর নিম্নচাপবলয়

৫। উপমেরু দক্ষিণ নিম্নচাপ বলয়

৬। মেরুদেশীয় উত্তর উচ্চ চাপ বলয়

৭। মেরু দেশীয় দক্ষিণ উচ্চ চাপ বলয়

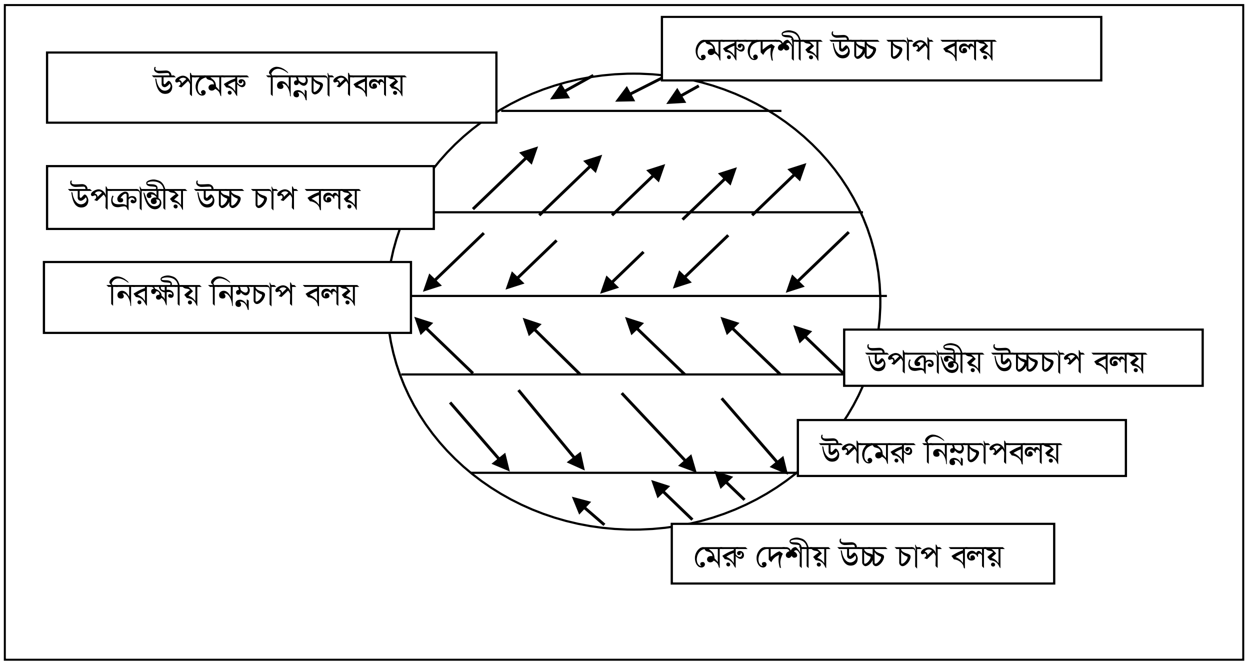

চিত্র - ৬.৩ বায়ুর চাপবলয়সমূহ

বর্ণনার সুবিধার্থে প্রধান সাতটি বায়ুচাপ বলয়কে প্রধান চারটি বলয়ে বিভক্ত করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যথা-

১. **নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় (Equatorial Low-Pressure Belts):** নিরক্ষীয় অঞ্চলে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ০°-২৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে সূর্য প্রায় সারা বছর লম্বাভাবে কিরণ দেয় বলে তাপমাত্রা বেশি। তাপমাত্রা বাড়লে বায়ু হালকা ও উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে যায় এবং ওপরের শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে চাপ দেয় এবং স্থায়ীভাবে এ অঞ্চলে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়।

২. **উপক্রান্তীয় উত্তর ও দক্ষিণ উচ্চচাপ বলয় (Sub-Tropical North and South High Pressure Belts):** নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ হালকা বায়ু যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে ২৫°-৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ শীতল ও প্রসারিত হয়ে উচ্চ চাপ বলয়ের সৃষ্টি করে আংশিকভাবে নিচে নেমে আসে এবং বাকি অংশ মেরু প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। আবার মেরু প্রদেশের শীতল ও ভারী বায়ুর চাপ অধিক বলে ক্রান্তীয় প্রদেশের দিকে আসতে থাকে। ফলে উভয় মেরুতে ক্রান্তীয় প্রদেশে বায়ুচাপের আধিক্য থাকে এবং উচ্চ চাপ বলয়ের সৃষ্টি করে।

৩. **উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপবলয় (North & South Sub-Polar Low-Pressure Belts):** উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ৬০°-৬৫° অক্ষাংশের মধ্যে স্থায়ী নিম্নচাপ বলয়কে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপবলয় (Sub-Polar low Pressure Belt) বলে। মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়টি পৃথিবীর আবর্তন তথা গতিজনিত কারণে সৃষ্টি হয়েছে। বায়ু যখন বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয় তখন কেন্দ্রবিমুখী শক্তি বায়ুকে বাইরের দিকে তথা মেরুদেশীয় উচ্চ চাপ বলয়ের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে এই অঞ্চলে স্থায়ী নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রবিমুখী শক্তি নির্ণয়ের সূত্রটি হলো-

$$C = \frac{mv^2}{r}$$

এখানে,
c = কেন্দ্র থেকে বর্হিমুখী শক্তি
m = চলমান বস্তুর ভর
v = বায়ুর গতিবেগ
r = আবর্তন পথের ব্যাসার্ধ

বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ ছোটো হলে বায়ুর গতিবেগ অধিক হয় অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে বর্হিমুখী শক্তি ততো প্রবল হয়। এই কেন্দ্রবিমুখী শক্তির পরিমাণ পৃথিবীর উভয় মেরুর নিকটে সর্বাধিক। এই কারণে এখানে তাপমাত্রা কম হলেও বায়ু মেরুর দিকে, উর্ধ্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয় ও সারাবছর এখানে গভীর নিম্নচাপ বিরাজ করে।

৪. **উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় (North and South Polar High Pressure Belt):** উভয় মেরুতে সারাবছর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে এবং বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প কম থাকে। শীতল ভারী বায়ুর কারণে এখানে উচ্চ চাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। মূলত উভয় গোলার্ধে মেরু অঞ্চলে তাপজনিত শীতল তাপমাত্রা ও গতিজনিত কারণে উচ্চ চাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ুর আদ্রতা

Air Humidity

বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাকে বায়ুর আদ্রতা বলে। বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর জলীয়বাষ্পের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তার চাইতে অধিক জলীবাষ্প ধারণ করতে পারে না। বায়ুর এরূপ অবস্থাকে বলে পরিপৃক্ত বায়ু। একইভাবে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকলে পূর্বের ন্যায় বায়ু জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে না এবং জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয়। বায়ুর এইরূপ অবস্থাকে ঘণীভবন বলে। সাধারণত হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে বায়ুর আদ্রতা পরিমাপ করা হয়।

১. পরম আদ্রতা (Absolute Humidity) : নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে ঐ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর পরম আদ্রতা বলে। যেমন- ২০ ঘন সেন্টিমিটার বায়ুতে যদি ১০ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে তাহলে পরম আদ্রতা হবে ১০ গ্রাম ঘন সেন্টিমিটার। সাধারণত দিনে রাত্রি অপেক্ষা পরম আদ্রতা বেশি থাকে।

আপেক্ষিক আদ্রতা (Relative Humidity) : নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে একই তাপ ও চাপে বায়ু কী পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার অনুপাতকে আপেক্ষিক আদ্রতা বলে। আপেক্ষিক আদ্রতাকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আপেক্ষিক আদ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়। বাংলাদেশে শীতকালের বায়ুতে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা আপেক্ষিক আদ্রতা কম থাকে ।

আপেক্ষিক আদ্রতা = নির্দিষ্ট তাপ ও চাপের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ × ১০০ × একই তাপ ও চাপে জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা

সারসংক্ষেপ:

কোনো একক ক্ষেত্রফলের ওপর বায়ুর প্রযুক্ত বলের পরিমাণকে বায়ুচাপ বলে । বায়ুচাপের একককে 'বার' বলে, যা ১০,০০,০০০ ডাইন/ সেমি^{২} এর সমান। যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুরচাপ নির্ণয় করা হয় তাকে ব্যারোমিটার বলে। কোনো মানচিত্রে বা আবহাওয়া চিত্রে সমান বায়ুচাপবিশিষ্ট স্থানগুলোকে যে রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয় সেইসব রেখাকে সমচাপরেখা বলে। সমচাপ রেখার সাথে সমকোণ করে প্রতি একক আনুভূমিক দূরত্বে বায়ুচাপের যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে চাপ নতি বা চাপ অবক্রম বলে। চাপ অবক্রমকে ব্যারোমেট্রিক ঢালও বলে। চাপ নতি বা চাপ অবক্রম প্রকাশ করার জন্য উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। উচ্চ চাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে সমচাপরেখার সাথে সমকোণে যে শক্তি কাজ করে তাকে চাপের অবক্রমজনিত বল বলে। আশে পাশের বায়ুচাপের সাথে তুলনা করে কোনো স্থানের বায়ুর উচ্চ ও নিম্নচাপ বলা হয়। সাধারণত উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর চাপ প্রায় ১১৫ মিলিবার কমে। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রভাবিত হয়। বায়ুচাপ আনুভূমিক দিক অপেক্ষা উলম্বভাবে অধিক পরিবর্তিত হয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুরচাপ ১০১৩ মিলিবার এবং উচ্চ পর্বত শিখরে (৮৮৪৮ মি. উচ্চতা) ৩২০ মিলিবার। বায়ুর চাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। পৃথিবীতে প্রধানত ৭টি চাপ বলয় আছে। যথা- নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, উপক্রান্তীয় উষ্ণ উচ্চ চাপ বলয়, উপক্রান্তীয় দক্ষিণ উচ্চচাপ বলয়, উপমেরু উত্তর নিম্ন চাপবলয় উপমেরু দক্ষিণ নিম্নচাপ বলয়, মেরুদেশীয় উত্তর উচ্চ চাপ বলয় এবং মেরু দেশীয় দক্ষিণ উচ্চ চাপ বলয়। বায়ুর আদ্রতা ও বায়ুমণ্ডলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাকে বায়ুর আদ্রতা বলে। কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার চাইতে অধিক জলীবাষ্প ধারণ করতে পারে না। বায়ুর এরূপ অবস্থাকে বলে পরিপৃক্ত বায়ু। একইভাবে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকলে পূর্বের ন্যায় বায়ু জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে না এবং জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয়। বায়ুর এইরূপ অবস্থাকে ঘণীভবন বলে। সাধারণত হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে বায়ুর আদ্রতা পরিমাপ করা হয়। পরম আদ্রতা হলো - নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে ঐ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর পরম আদ্রতা বলে। অপরদিকে, আপেক্ষিক আদ্রতা নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে একই তাপ ও চাপে বায়ু কী পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার অনুপাতকে আপেক্ষিক আদ্রতা বলে।

পাঠ-৬.৫ আবহাওয়া ও জলবায়ু
Weather and Climate

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংজ্ঞা ও উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পৃথিবীর প্রধান জলবায়ু অঞ্চল সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

যে কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সম্মিলিতভাবে সার্বিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়ার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়ার ২৫-৩০ বছরের গড় অবস্থাকে সে স্থানের জলবায়ু (Climate) বলে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুর গতি, বায়ুর আদ্রতা ও বৃষ্টিপাত। উষ্ণ বায়ু হতে শীতল বায়ুতে তাপ পরিবহন, ভূ-পৃষ্ঠ কর্তৃক তাপ তাপ বিকিরণ, পরিবহন এবং বিকিরণের সময় তাপের পরিচলন, জলীয়বাষ্পের সুপ্ততাপ এবং সর্বোপরি বায়ুর সংকোচন প্রসারণ এবং আনুভূমিক সঞ্চালনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। প্রধানত ৬টি প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। যথা- ১. পরিবহণ, ২. বিকিরণ, ৩. পরিচলন, ৪. ঘনীভবন, ৫. আনুভূমিক বায়ুর সঞ্চালন,৬. বায়ুর সংকোচন ও প্রসারণ । সূর্যরশ্মি, উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি, জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র স্রোত প্রভৃতি কারণে বায়ুমণ্ডলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্র বায়ুর তাপমাত্রার পার্থক্য হয়ে থাকে। যথা-

আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক
Components and Factors of Weather and Climate

১। **তাপমাত্রা ও অক্ষাংশ (Temparature and Latitude):** সৌরতাপের পরিবহন ও বিকিরণের ওপর যে কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ভর করে। এছাড়াও ভূ-পৃষ্ঠে সৌরতাপের বিকিরণের ভিন্নতা রয়েছে। যার দরুন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পতিত হয় বলে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা কম থাকে। অন্যদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় বলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা মেরু অঞ্চলের চেয়ে অধিক। আবার, নিরক্ষীয় অঞ্চলে মেঘ দ্বারা প্রতিফলিত হয় এবং বাষ্পীভবনের কারণে উপক্রান্তীয় অঞ্চল অপেক্ষা তাপমাত্রা কম। উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মির লম্বভাবে পতন ও মেঘমুক্ত আকাশের কারণে এ অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাধিক তাপমাত্রা দেখা যায়।

২। **তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ও উচ্চতা (Decrease- Increase of Temparature and Hight):** পৃথিবীর সকল তাপের একমাত্র উৎস সূর্য থেকে গৃহীত সৌরশক্তি। সৌরশক্তি দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার পর পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ার উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরের দিকে পরিমাপ করা হয় ততই বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে প্রতি ১ কিলোমিটারে ৬.৫°C করে তাপমাত্রা কমতে থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চল তাপমাত্রা অধিক হওয়ার কথা থাকলেও উচ্চতার কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে নেপালের হিমালয় পর্বত ও আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও পর্বতদ্বয়ের শীর্ষদেশে বরফ জমে থাকে। প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় ৬.৫°C তাপমাত্রা কমার এ হারকে স্বাভাবিক তাপহ্রাস হার বা পারিপার্শ্বিক তাপহ্রাস হার বলে। বায়ুর এই তাপহ্রাস হার নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়;

$ELP = \frac{T_2 - T_1}{\Delta Z}$	এখানে, T_2 = বায়ুস্তরের উপরিভাগের তাপমাত্রা T_1 = বায়ুর নিচের স্তরের তাপমাত্রা ΔZ = বায়ুস্তরটির গভীরতা ELP = পারিপার্শ্বিক তাপ হ্রাস হার

৩। **জল ও স্থলের প্রকৃতি (Nature of Land & Water):** যে কোনো স্থানের আবহাওয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে উক্ত স্থানের স্থলভাগ ও জলভাগের প্রকৃতির ওপর। স্থলভাগ, জলভাগের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ ও শীতল হয়। স্থলভাগ ও জলভাগ একই সময়কালব্যাপী সৌরতাপ গ্রহণ করলেও সৌরতাপের ভিন্নতা হয়। কারণ স্বচ্ছ পানিস্তরে সৌরতাপ অধিক গৃহীত ও বিকিরণ হয়, একইভাবে অস্বচ্ছ শিলাস্তরে কম সৌরতাপ গৃহীত হয়। জলভাগ পরিবহন পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয় বলে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ উত্তপ্ত ও শীতল হতে ৫ গুণ অধিক সময় প্রয়োজন। একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত সমুদ্র থেকে দূরবর্তী এলাকার ও স্থলভাগের মধ্যকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য হয়। বায়ুপ্রবাহ জলবায়ুকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যে স্থানের ওপর দিয়ে প্রভাবিত হয় সেখানে বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণত সমুদ্র হতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত অধিক হলে উত্তাপ কমে। বাংলাদেশে জুলাই মাসে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় মে ও জুন মাস অপেক্ষা জুলাই মাস অধিক শীতল।

৪। **সমুদ্র স্রোত (Ocean Current):** সমুদ্রের শীতল স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শীতল এবং উষ্ণ স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু থাকে যেমন- ইংল্যান্ড ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল অপেক্ষা অীধক উষ্ণ থাকে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে। এছাড়া উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের জন্য নরওয়ের উপকূলে বছরের কোনো সময়ই বরফ জমে না।

৫। **পর্বতের অবস্থান ও জলবায়ু (Location of Mountain and Climate)**: স্থল ও জলভাগের প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের ন্যায় পর্বতের অবস্থান যে কোনো স্থানের বায়ুর প্রবাহ, তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। শীতল বায়ুপ্রবাহ পর্বত অতিক্রম করতে পারে না বলে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু শীতকালে হিমালয় পর্বতে বাধা পায় বলে বাংলাদেশে ও ভারতে শীত অধিক হয় না। এছাড়াও পর্বতের একপার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয় অপরপার্শ্বে বৃষ্টি হয় না।

বনায়ন, ভূমির ঢাল, মাটির প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। একটি দেশের মধ্যে একাধিক জলবায়ু অঞ্চল থাকতে পারে বা একাধিক দেশের মধ্যে একই জলবায়ু অঞ্চল থাকতে পারে।

জলবায়ুর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে জলবায়ুকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

- **সমভাবাপন্ন জলবায়ু (Equable Climate):** সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের তেমন কোন তীব্রতা নেই।
- **চরমভাবাপন্ন জলবায়ু (Extreme Climate):** চরমভাবাপন্ন জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হয়।
- **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (Temperate Climate):** নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিক গরম ও অধিক শীতল হয় না।
- **আদ্র ও শুষ্ক জলবায়ু (Wet and Dry Climate):** বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হলে আদ্র জলবায়ু, বৃষ্টিপাত একেবারেই না হলে শুষ্ক জলবায়ু।

জলবায়ু অঞ্চল

Climate Region

বায়ুর তাপ, চাপ, আদ্রতা, উষ্ণতা, বায়ু প্রবাহের গাতি ও বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে প্রধান পাঁচটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। চিত্র- ৬.৪ এবং টেবিল ৬.২ লক্ষ করুন।

বিশ্ব জলবায়ু অঞ্চল

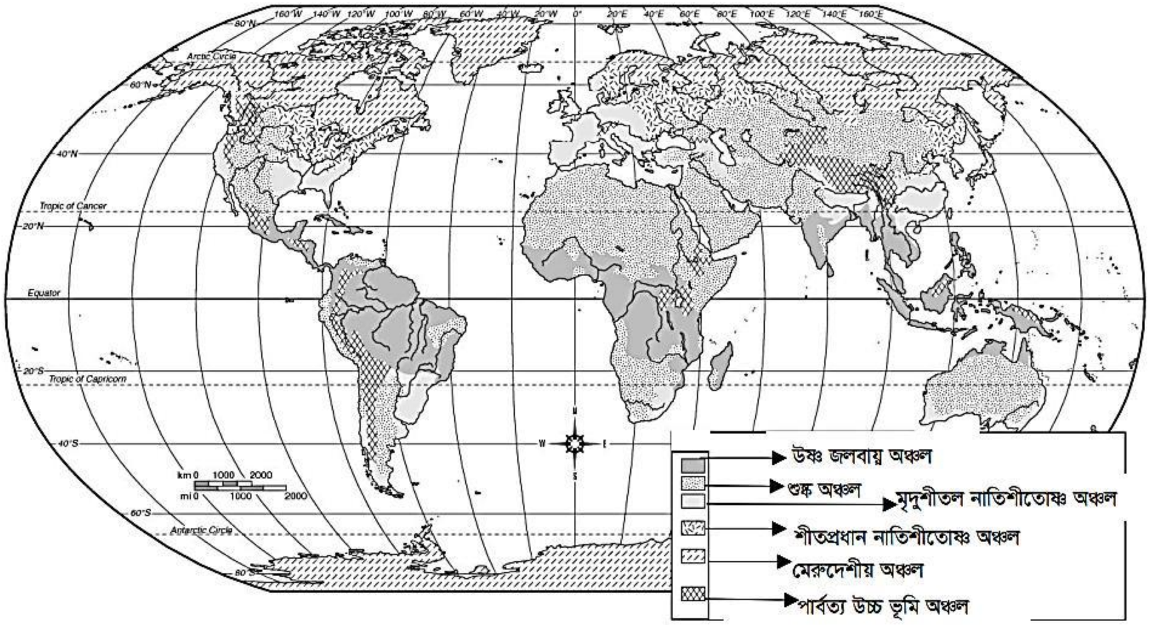

চিত্র - ৬.৪ পৃথিবী জলবায়ু অঞ্চল

টেবিল ৬.২ পৃথিবীর প্রধান চারটি জলবায়ু অঞ্চল[৪]

ক) উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল	১. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল ২. ক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ৩. ক্রান্তীয় মহাদেশীয় অঞ্চল ৪. মৌসুমি অঞ্চল ৫. ক্রান্তীয় মেরু অঞ্চল
খ) মৃদুশীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	৬.সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল ৭.মহাদেশীয় অঞ্চল ৮.মেরু দেশীয় অঞ্চল
গ) শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	৯. সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ১০. শীতল মহাদেশীয় অঞ্চল
ঘ) মেরুদেশীয় অঞ্চল	১১. তুন্দ্রা অঞ্চল ১২. চির তুষারাবৃত অঞ্চল
ঘ) পার্বত্য উচ্চ ভূমি অঞ্চল	১৩. ক্রান্তীয় উচ্চভূমি ১৪. মধ্য অক্ষাংশীয় উচ্চ ভূমি
ঙ) শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চল	১৫. মরুভূমি

4 https://www.bgcharlem.org/single-post/climate-regions.

সারসংক্ষেপ:

যে কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সম্মিলিতভাবে সার্বিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়ার ২৫-৩০ বছরের গড় অবস্থাকে সে স্থানের জলবায়ু বলে। বায়ুমণ্ডলে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র তাপমাত্রা ও অক্ষাংশ, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ও উচ্চতা, জল ও স্থলের প্রকৃতি, সমুদ্র স্রোত, পর্বতের অবস্থান ও জলবায়ু প্রভৃতি কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য হয়ে থাকে। এ কারণে উল্লিখিত নিয়ামকসমূহ আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও নিয়ামক। সৌরতাপের পরিবহন ও বিকিরণের ওপর যে কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ভর করে। সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পতিত হয় বলে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা কম থাকে। অন্যদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় বলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা মেরু অঞ্চলের চেয়ে অধিক। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরের দিকে যাওয়া হয় ততই বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে প্রতি ১ কিলোমিটারে ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা কমতে থাকে। জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ দ্রুত উষ্ণ ও শীতল হয়। এ কারণে স্থলভাগ ও জলভাগ একই সময়কাল ব্যাপী সৌরতাপ গ্রহণ করলেও সৌরতাপের ভিন্নতা হয়। সমুদ্রের শীতল স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শীতল এবং উষ্ণ স্রোতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ থাকে। স্থল ও জলভাগের প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের ন্যায় পর্বতের অবস্থান যে কোনো স্থানের বায়ুর প্রবাহ, তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ুর প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে জলবায়ুকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- সমভাবাপন্ন জলবায়ু, চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, আদ্র ও শুষ্ক জলবায়ু। অপরদিকে বায়ুর তাপ, চাপ, আদ্রতা, উষ্ণতা,বায়ু প্রবাহের গতি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে প্রধান ছয়টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল, মৃদু শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, মেরুদেশীয় অঞ্চল এবং পার্বত্য উচ্চ ভূমি অঞ্চল এবং শুষ্ক ও জলবায়ু অঞ্চল।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. অশ্মমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার কাকে বরে? লিথোস্ফিয়ারের প্রধান স্তরসমূহ বর্ণনা করুন।

২. কেন্দ্রমন্ডল কাকে বলে?

৩. বায়মন্ডল কী? বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ কী কী এবং বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করে আপনার মতামত দিন।

৪. সমমণ্ডল কাকে বলে?

৫. বিষমমণ্ডল কাকে বলে?

৬. বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ কী কী?

৭. বায়মণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফেয়ার কেন বিমান চলাচলের উপযোগী ব্যাখ্যা করুন।

৮. স্ট্রাটোস্ফেয়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর। পরিবেশের জন্য এই ওজোন (O_3) স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

৯. অরোরা কাকে বলে?

১০. পৃথিবীর তাপসমতা পরিবেশের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? পৃথিবীর তাপসমতা বিশ্লেষণ করুন।

১১. বায়ুচাপ এবং বায়ুর আদ্রতা কাকে বলে?

১২. বায়ুর চাপ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখুন।

১৩. বায়ুর চাপবলয়সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা করুন।

১৪. পরম আদ্রতা ও আপেক্ষিক আদ্রতা কাকে বলে?

১৫. আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে?

১৬. আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ কী কী? পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ার নিয়ামকসমূহের প্রভাব আলোচনা করুন।

১৭. পৃথিবীর প্রধান চারটি জলবায়ু অঞ্চল কী কী?